স্ট্রোক চিকিৎসা ও প্রতিকার

ডাঃ বদরুল হক, নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৪ অক্টোবর ৯৫ ইং

বর্তমান বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে স্ট্রোক অন্যতম। ভয়াবহ এই ব্যাধি হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরেই গণ্য করা হয়। এই রোগের জন্য মানসিক ও শারীরিক পঙ্গুত্ব বরণ করিতে হয়। বিশ্বে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৭৫,০০০ ব্যক্তি এই ব্যাধির কারণে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে। মস্তিস্কের রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতের কারণেই "প্রধানত ঃ স্ট্রোক হইয়া থাকে। স্ট্রোককে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (১) সেরিব্রাল ইনফ্রকট (রক্ত চলাচল বিঘ্নিত জনিত), (২) সেরেব্রাল হিমোরেজ (রক্তক্ষরণজনিত)। ইনফ্রাকট আবার দুই কারণে হইয়া থাকে। থ্রাম্বসিস এবং এমবোলাস। এখন থ্রাম্বসিস ও এমবোলাস সম্মন্ধে বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। মস্তিস্কের কোন রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বাঁধা সৃষ্টি হইলে প্রতিবন্ধকতা হয়। এই প্রতিবন্ধকত্য প্রধানতঃ থ্রম্বসি ও এমবোলাসের জন্য হইয়া থাকে। আমাদের দেহের কোলেস্টরল, লিপিড, ক্যালসিয়িাম প্রভৃতির মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ায় রক্তনালীর প্রচীরে সেইগুলি জমাট বাঁধিয়া রক্তনালীর ভিতরে এক প্রকারের স্তর তৈরী করে। এই স্তর জমিয়া রক্তনালীতে বাঁধার ফলে থ্রাম্বটিক ইনফ্রাকশন হয়। যাার শতকরা হার ৫০-৬০ ভাগ। এমবোসিস স্ট্রোক সাধারণত হৃদরোগের কারণে হইয়া থাকে। যাহার হার ৩০-৪০ ভাগ। সেরিব্রাল হিমোরেজ দুই কারণে হইয়া থাকে (১) এরাকনয়েড হিমোজে (৫%), (২) ইন্ট্রা সেরিব্রাল হিমোরেজ (১০%)। উচ্চ রক্ত চাপজনিত কারণে মস্তিস্কের ভিতর যে কোন রক্তনালী ছিড়িয়া যে রক্তক্ষরণ হয় উহাকে হিমারেজিক স্ট্রোক বা রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক বলা হয়। স্ট্রোক রোগীর সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এই রোগের শতকরা ৮৫ ভাগই সেরিব্রাল ইনফ্রাকট বা মস্তিস্কের রক্ত চলাচলের বিঘ্নের কারণে হইয়া থাকে। বাকী ১৫% সেরিব্রাল হিমোরেজ বা রক্তক্ষরণজনিত কারণে হইয়া থাকে। সেরিব্রাল ইনফ্রাকটজনিত কারণে ২৫-৪০% মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে। যদি স্ট্রোক হওয়ার পর প্রথম ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান না হারায় এবং রোগী সম্পূর্ণ সজ্ঞানে থাকে সেই ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ২৫% ধরিয়া লওয়া হয়। আর যদি রোগীর জ্ঞান লোপ পায় সেই ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৫০%। একনাগাড়ে ৩৬ ঘন্টার উপরে কোন রোগী যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে তাহা হইলে সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, স্ট্রোক হওয়ার পর এক সপ্তাহের ভিতরে ৩০% মৃত্যু বরণ করে। যাহারা জীবিত থাকে তাহাদের মধ্যে ২০% সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়, ১০% সামান্য পঙ্গুত্বের শিকার হয় এবং অবশিষ্টাংশরা সারাজীবন পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহন করে। কাহাদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ঃ

- বয়স ৪০ বৎসরের পর হইতেই স্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে। তবে ২৫ বৎসর বয়সেও স্ট্রোক হওয়ার ঘটনা বিরল নয়।
- উক্ত রক্তচাপ - উচ্চ রক্তচাপের কারণে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তবে এই ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম নাই যে রক্তচাপ কত উচ্চ হইলে স্ট্রোক হইবে।
- হৃদরোগ - রিউমেটিক হার্ট ডিজিস, কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট, কার্ডিয়াক রোগের জন্য স্ট্রোক হইয়া থাকে।
- ডায়াবেটিক - ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়।
- অনেক সময় বংশগত কারণেও স্ট্রোক হইয়া থাকে।
- স্থুলকায় ব্যক্তি ও ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ স্ট্রোক হওয়ার পক্ষে কাজ করিয়া থাকে।
- মহিলাদের ক্ষেত্রে জন্মবিরতীকরণ বড়ির কারণে রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

- যাহারা শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম করিয়া থাকে এবং যাহারা আরামবিলাসী জীবন যাপন করে তাহাদের ষ্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ

- কাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির হঠাৎ মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ও দ্রুত জান হারাইয়া ফেলে, শরীরের এক দিকে অবশ হইয়া যায়, কথা বলিতে পারে না া বলিতে অসুবিধা হয়, মুখ একদিকে বাঁকা হইয়া পড়ে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইহাকে রক্তক্ষরণজনিত বা সেরিব্রাল হিমোরেজ ষ্ট্রোক বলিয়া থাকি।

- বিশ্রাম অবস্থায় অথবা সকালে ঘুম হইতে উঠার পর কাহারো যদি হঠাৎ করে শরীরের একদিক অবশ বোধ করে, কথা বলিতে অসুবিধা হয় এবং ধীরে ধীরে দূর্বলতা বাড়িতে থাকে তবে তাহা মস্তিস্কের রক্ত চলাচল বিঘ্নিতজনিত বা সেরিব্রাল ইনফ্রাকট এর কারণে হইয়া থাকে।

রোগ নির্ণয় ঃ

সি.টি. স্ক্যান এম. আর. আই, প্যাটস্ক্যান প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই এই রোগ নির্ণয় করা যায়। এইসব পরীক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল যাহা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য। সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নিউরোলজিষ্ট রোগের বর্ণনা শুনিয়া ও রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন রোগীর কি ধরণের ষ্ট্রোক হইয়াছে এবং ইহার কি চিকিৎসা ও প্রতিকার।

চিকিৎসা ও প্রতিকার ঃ

ষ্ট্রোক রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা অভিজ্ঞ নিউরোলজিষ্ট এর শরনাপন্ন হইতে হইবে। অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে স্যালাইন ও অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নাকে নল দ্বারা দুই ঘন্টা পর পর রোগীকে খাওয়াইতে হয়। প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর রোগীকে এপাশ-ওপাশ শোয়াইতে হয় যাহাতে বেসসোর বা মাজায় ঘা না হয়। নল দ্বারা প্রস্রাব করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। রোগীর চিকিৎসাকল্পে অভিজ্ঞ নিউরোলজিষ্ট সাধারণতঃ রোগীকে এন্টিবায়োটিক, ডেক্সামিথোসেন, ম্যানিটল, ডেক্সট্রোন-ফার্টি ইনজেকশন দিয়া থাকেন মস্তিস্কের ভিতর চাপ কমানোর জন্য। যাহা রোগীর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরিয়া আসে ও সুস্থ হয়। যাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই তাহাদের পূর্ণ বিশ্রামে থাকিতে বলা হয়। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ট্যাবলেট ভিনপেসিটিন, পেনটক্সিফাইলিন ও অ্যাসপ্রিন দিয়া থাকেন। ষ্ট্রোক রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিজিওথেরাপীর ব্যবস্থা করিতে হয়। যে কারণসমূহ দুর করিবার ব্যবস্থা নিতে হইবে। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে। অনেকে আমরা মনে করি যে, ব্রেন ষ্ট্রোক ও হার্ট ষ্ট্রোক এ জিনিস। আসলে তাহা নয়। ব্রেন ষ্ট্রোকে রোগীর এক দিক অবশ হইয়া যায় এবং কথা বলিতে অসুবিধা হয়, যাহা হার্ট ষ্ট্রোকে হয় না। ষ্ট্রোক রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণে আমাদের এই রোগ সম্মন্ধে আরো সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি ব্যায়াম করি, চর্বি জাতীয় খাদ্য বর্জন করি, উচ্চ রক্তচাপ ঔষধের মাধ্যমে আয়ত্বে রাখিতে পারি এবং যতদুর সম্ভব অযথা চিন্তা বা টেনশন না করি তবে কিছুটা হলেও এই রোগ হইতে রেহাই পাইতে পারি। আর ধুমপান আমাদের অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। এইভাবে আমরা আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করিয়া ষ্ট্রোকের মত ভয়ংকর ব্যাধিকে অনেকখানি প্রতিরোধ করিতে পারি।